হিন্দুদের সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করার আইনি তাৎপর্য

এম. আর. সামসদ

২৪ অক্টোবর, ২০২২

ধর্ম ও ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অধিকারের বিষয়টি, যা কিনা ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী একটি মৌলিক অধিকার, তাকে স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভারতের সংবিধান তৈরির সময় সংবিধান সভার উনত্রিশ জন সদস্য দুই দিন ব্যাপী একটি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। সংবিধানের ধারা ২৯ বৈশিষ্টপূর্ণ *ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি* "সংরক্ষণের" অধিকার দেয়। ধারা ৩০ অনুযায়ী নিজেদের "পছন্দ" মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার অধিকার ভারতের "ধর্ম" ও "ভাষা" ভিত্তিক সমস্ত সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর আছে। এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলার সময় কয়েকজন সদস্য এই অধিকারকে "গোষ্ঠীভিত্তিক" করারও দাবি জানান। আইন প্রণেতাদের একটি দল খুশি ছিলেন না, কারণ তাঁরা শুধু তাঁদের বিশিষ্ট ভাষাকে "সংরক্ষণ" নয়, তার সঙ্গে "উন্নয়ন" শব্দটিকেও যোগ করতে চেয়েছিলেন। তবে, "গোষ্ঠী" বা "উন্নয়ন" – এই শব্দ দুটির কোনটিকেই আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত সংবিধানের অংশ হিসেবে রাখা হয় নি।

সমসাময়িক রাজনীতির, বিশেষ করে যে কটি রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যায় কম সেখানে তাঁদের "সংখ্যালঘু" হিসেবে ঘোষণা করার জন্য কেন্দ্রসরকারের কাছে পেষ করা দাবিটির অর্থ বোঝার জন্য এই ঐতিহাসিক পটভূমিকা জানা জরুরি। ভারতের জনসংখ্যার পঁচাশি শতাংশই যে হিন্দু ধর্মাবলম্বী, সেই কথাটি মাথায় রাখলে বোঝা যাবে যে, এই দাবিটি সংখ্যালঘুর সাধারণভাবে স্বীকৃত সংজ্ঞা এবং তার অন্তর্নিহিত তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায়।

একই সঙ্গে, ২০০২ সালে টিএমএ পাই মামলায় ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সংখ্যালঘু সংক্রান্ত যে ঐতিহাসিক রায়টি দেয় সেটি অনুযায়ী, এই দাবীর একটি আইনি ভিত্তি আছে। পাই-এর মামলাটি ইঙ্গিত করে যে, ভারতের রাজ্যগুলি গঠনের প্রাথমিক শর্ত ছিল ভাষা এবং সেই কারণেই, সংবিধানের ধারা ৩০-এর প্রয়োজনে রাজ্যের প্রেক্ষিতে "ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু" পরিচয়টি নিশ্চিত করা উচিত।

এই একই যুক্তি অনুসরণ করে "ধর্মীয় সংখ্যালঘুর" অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে; দেশের সমস্ত নাগরিক সাধারণত যে অধিকারগুলি পেয়ে থাকেন সেগুলির পাশাপাশি আরও কিছু অতিরিক্ত সুবিধা যে সংখ্যালঘুরা পান সেই বিষয়টি ভালোভাবে নেওয়া হয় না। পাই মামলার একজন বিচারক এও বলেন যে, যে বিশেষ অধিকারগুলি হিন্দু "সংখ্যালঘুদের দেওয়া হয়েছিল" ভারতীয় সংবিধান তার রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গগুলি সকলের সামনে তুলে ধরে। সংখ্যালঘুদের হাতে সংবিধান অনুযায়ী অধিকার থাকার বিষয়টি সংবিধানের মূল কাঠামোর অংশ এবং তা সংশোধন বা হস্তান্তর সম্ভব নয়। এই জন্য, তাদের সংখ্যাকে রাজ্যস্তরের প্রেক্ষিতেই বিবেচনা করতে হবে বলে হিন্দুদের যে দাবি তাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

এই পর্যায়ে সব থেকে আকর্ষনীয় বিষটি হল, পাই মামলার রায়টি আসলে ভারতের বহুস্তরীয় বৈচিত্রকেই স্বীকার করে। ভাষা, জাতি বা ধর্ম যাই নির্বিশেষে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ও স্বতন্ত্র পরিচয় আছে, যাকে এমন ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে যাতে এক জাতি হিসেবে সমন্বিত করার পরেও সেই পরিচয় ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যকে প্রতিবিম্বিত করে – এই বিষয়টি এই রায়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্য দিকে, সংখ্যালঘু মুসলিমরা যাতে সরকারী সংগঠনে অংশগ্রহণের সুযোগ না পান তা আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ তোষণকারী সরকার নিশ্চিত করেছে এবং কর্মসংস্থানের জন্য এমন সমস্ত শর্ত আরোপ করা হয়েছে যাতে অধিকাংশ মুসলিম ও খৃস্টান ধর্মাবলম্বীরা দেশ চালানোর প্রক্রিয়ায় অংশ না নিতে

পারেন। তাদের পোষাক, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাত্রা ও ধর্মীয় রীতিনীতি এই আন্দোলন দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং তা আবার প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তর থেকে সমর্থনও পাচ্ছে।

হিন্দুত্বের ধারণার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা "জাতীয়তাবাদের" যে সংজ্ঞা বর্তমান সরকারের অভীষ্ট তাকে সম্ভব করতে, ঐক্যের নীতিকে নিরর্থক প্রমাণ করে এই সরকার "একজাতীয়তাবাদ" নীতিকে সমর্থন করে। বৈদ্যুতিন মাধ্যম যে বহিরঙ্গ নির্মাণ করেছে তা এমন একটি আখ্যানের নির্মাণ করে, যে আখ্যান এই দেশের "জাতীয়" সামাজিক-ধর্মীয় চরিত্রকে সংজ্ঞায়িত করার পাশাপাশি দাবি করে যে, মুসলিম ও খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের সাংস্কৃতিক চর্চা, ভাষা ও বিশ্বাসপ্রণালী ভারতের নিজস্ব নয় এবং তাই সেগুলিকে বর্জন করতে হবে। এই ধরণের জাতীয়তাবাদ কখনই একটি সর্বসমাবিষ্ট সমাজের লক্ষণ নয়।

হিন্দুদের সংখ্যালঘু বলে গণনা করতে শুরু করলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদয় হয়। প্রথমত, কাকে হিন্দু বলে ধরা হবে? দ্বিতীয়ত, এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করার জন্য কি সংসদের হাতে একচেটিয়া ক্ষমতা আছে এবং রাজ্যের আইনসভাগুলি কি সংখ্যালঘু বলে কাদের ধরা হবে তা চিহ্নিত করার উপযুক্ত?

সুপ্রিম কোর্টের ১৯৬৬ সালের একটি রায়ে, প্রধান বিচারপতি পি. বি. গজেন্দ্রগাডকরের মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য পেষ করার সময়, পাঁচ বিচারপতির একটি বেঞ্চ লেখেন যে, হিন্দুত্ব (হিন্দু) "একজন মাত্র ইশ্বরের পূজা করে না, একটি নির্দিষ্ট ধর্মমতে বিশ্বাস করে না, একটি সুনির্দিষ্ট ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠানের ধারাকে অনুসরণ করে না; কার্যত, তা কোন ধর্ম বা বিশ্বাসের সংকীর্ণ প্রথাগত বৈশিষ্টকে চরিতার্থ করতে পারে বলে মনে হয় না। একে বৃহদার্থে একটি জীবনযাপনের পন্থা বলে আখ্যায়িত করা যায় এবং তার বেশি কিছু না।" পরে, ১৯৯৫ সালে বিচারপতি জে. এস. ভার্মা এই সংজ্ঞাটিকে "হিন্দুত্ব" – এই রাজনৈতিক আখ্যার সঙ্গে একত্রে পাঠ করেন। ১৯৯৫ সালের সুপ্রিম কোর্ট স্বীকৃত এই সংজ্ঞাটির পরে অধিকাংশ ভারতীয় নাগরিক, স্বাভাবিকভাবেই, "হিন্দু" বলে প্রতিষ্ঠিত।

হিন্দু বিবাহ আইনের মত আইনগুলি বলে যে, মুসলিম, খৃস্টান, পার্সি বা ইহুদী ধর্মাবলম্বী বাদে হিন্দু আইন সকলের প্রতি প্রযোজ্য। এখানেও এই চারটি ধর্ম, "হিন্দু" নামক ধারণাটির অংশ নয়। এখন প্রশ্ন হল, "সংখ্যালঘু" অবস্থান চায় যে গোষ্ঠী তাকে ঘিরে কি এমন একটি শিথিল সংজ্ঞা তৈরি করা সম্ভব, যার সাহায্যে সেই গোষ্ঠী ভারতীয় সংবিধানের ধারা ২৯ ও ৩০ অনুযায়ী সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্যতা পায়? এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানি যে, সুপ্রিম কোর্ট, ঘোষিত সংখ্যালঘুদের তালিকায় যুক্ত হওয়ার জন্য অন্যান্য গোষ্ঠীর দাবি জানানকে উৎসাহ না দিয়ে তার বদলে কি ভাবে এমন সামাজিক পরিস্থিতি গড়ে তোলা যায় যাতে এই ঘোষিত সংখ্যালঘু তালিকাকে ক্রমশ ছোট করতে করতে একেবারেই বাতিল করা যায় তার পন্থা ও উপায় খোঁজার নির্দেশ কমিশন ফর মাইনরিটিজকে দিয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটির ক্ষেত্রে, সংবিধানের কাঠামো আপাত-যুক্তরাষ্টীয় হওয়ায়, কেন্দ্রসরকারের পাশাপাশি, রাজ্যসরকারের হাতেও তার অধীনস্থ অঞ্চলের ভাষাগত ও ধর্মীয় বৈচিত্র্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষমতা আছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রসরকারের অবস্থান ভাসা ভাসা ও সুবিধাবাদী বলে মনে হয়; প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রসরকার সুপ্রিম কোর্টে একটি অবস্থান নেয় এবং ঘোষণা করে যে, এ ক্ষেত্রে সংসদ ও রাজ্যসরকার, উভয়েরই যুগপত ক্ষমতা আছে। কিন্তু, সেই একই মামলা যখন একটি অনিশ্চিত অবস্থায় পৌঁছয়, তখন কেন্দ্র পরবর্তী একটি হলফনামার মাধ্যমে জানায় যে, সংখ্যালঘু পরিচয় ঘোষণা করার অধিকার একমাত্র কেন্দ্রসরকারের হাতেই অর্পিত। কেন্দ্রের এই অবস্থান অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক কাঠামোর ভিতরে সংঘাত সৃষ্টি করবে। বলাই বাহুল্য, কেন্দ্রের ক্ষমতার পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষাগুলিও রাজ্যের আইনসভাগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন।

যে আইনগুলি ধর্ম সংক্রান্ত অধিকারকে প্রভাবিত করে, সেগুলি সরকারী শৃঙ্খলা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অঙ্গ, এবং তার সঙ্গে এই আইনগুলি রাজ্যের আইনি ক্ষমতার অধিকারেরও অন্তর্গত। ভাষা ও ধর্ম – "সংখ্যালঘু" পরিচয় নির্ধারণের এই দুটি প্রাথমিক শর্তই যুগপতভাবে রাজ্য ও কেন্দ্রের আইনি এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে। এর ফলে, আমরা কি কোনভাবেই "সংখ্যালঘু" পরিচয় ঘোষণা করার ক্ষমতা থেকে রাজ্যকে বাদ দিয়ে দিতে পারি?

কেন্দ্র নিজের অবস্থানের এই সম্পূর্ণ বিপরীতদিকে ঘুরে যাওয়ার ফলে কেন্দ্রের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা জড় হবে। এর ফলে, কেন্দ্রসরকারের চালিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিত্বের অনুপস্থিতির মত বহুমুখী সমস্যা সামনে এসে পড়বে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল এর "যুক্তরাষ্ট্রীয়" কাঠামো, যার সংশোধন সম্ভব নয়। শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের বৈচিত্র্যকে আঞ্চলিকস্তরে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রক্রিয়াটিই এই ধরনের সংকল্পে পৌঁছনোর সব চেয়ে ভাল পন্থা।

আইনসভার সৃষ্টি করা বিদ্যমান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আলোচনায় ফিরে আসা যাক। সংসদ ১৯৯২ সালে একটি আইন প্রণয়ন করেছিল, যার মাধ্যমে ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কমিশনের কাজ হল সংখ্যালঘুদের উন্নতি ও উন্নয়নের মূল্যায়ণ করা এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংবিধানে যে নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলি ঠিক মত কাজ করছে কিনা তার খেয়াল রাখা।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষিত সংখ্যালঘুদের কার্যকরীভাবে নিরাপত্তা দেওয়ার বদলে এই সংস্থাটি কেবলমাত্র একটি শোভাবর্ধক অঙ্গে পরিণত হয়েছে। যে রকম অনুভূতিহীনভাবে এই সংস্থাটি কাজ করে তা ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনের মত সংস্থা, যা আগে ভারতের একজন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পরিচালনা করতেন এবং বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারপতি পরিচালনা করেন, তার থেকে কোনভাবেই আলাদা নয়। যখন দেশের সামগ্রিকভাবে উচ্চতম সংখ্যায় সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর তালিকায় যুক্ত হবে, তখন এই কমিশনটি তাদের কাজের ধরণ বদলায় কিনা সেটাই দেখার বিষয়। ২০০৪ সালে ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করা হয়, যার সাহায্যে, কে "সংখ্যালঘু" তা ঘোষণা করার যে ক্ষমতা কেন্দ্রে হাতে আছে তা সহ, শিক্ষা সংগঠনকে সংখ্যালঘুদের জন্য শিক্ষা সংগঠনের পরিচয় দেওয়া যায়। এর ফলে, কে/কারা সংখ্যালঘু তা নির্ধারণের প্রক্রিয়াটি তাদের ব্যক্তিগত বিবেচনার উপর নির্ভর করে। সেই অনুযায়ী, কেন্দ্রসরকার ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে ছয়টি গোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু বলে ঘোষণা করছে (পাই মামলার মূল তত্ত্ব নিয়ে কোনও রকম চিন্তা না করেই)।

সংবিধানের ধারা ২৯ ও ৩০ এমন একটি সমঝোতাকে রূপ দেয় যা ধর্মীয় সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর মধ্যে ভারসাম্য নিশ্চিত করে। একটি সুবিশাল সংখ্যাগুরুর দিক থেকে কোনও বৈষম্য যাতে না ঘটে তা নিয়ে সংখ্যালঘু, বিশেষত মুসলিম ও খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের, নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার জন্য সংবিধানে যে সর্বজনীন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা আদার ব্যাকোয়ার্ড ক্লাসেস (ওবিসি) এবং শিডিউলড কাস্ট (এসসি) ও শিডিউলড ট্রাইবসদের (এসটি) মত সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, যাঁদের জন্য এই একই সংবিধানের অন্য জায়গায় যে নিজস্ব সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছ্ তার অনুরূপ। ২৯ ও ৩০ ধারায় ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘুদের জন্য যা বন্দোবস্ত করা হয়েছে, তা এই সর্বজনীন ব্যবস্থার সঙ্গে একই সূত্রে বাঁধা। যদি এই দাবিটি সফল হয়, তবে বিশ্বের সামনে ভারত এমন একটি উদাহরণ হয়ে উঠবে, যে উদাহরণ অনুযায়ী দেশের সর্বাধিক প্রভাবশালী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী, যাদের হাতে সব রকম কর্তৃত্বের ক্ষমতা আছে, তাদেরও সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ থেকে সাংবিধানিক নিরাপত্তার প্রয়োজন – যে নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মিত হয়েছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সর্বাধিক পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর জন্য।

এম. আর. সামসদ দিল্লির বাসিন্দা এবং তিনি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট ও অন্যান্য হাই কোর্টে কর্মরত একজন আইনজীবী।